চতুর্দশ অধ্যায়

জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান

(Physics to Save Lives)

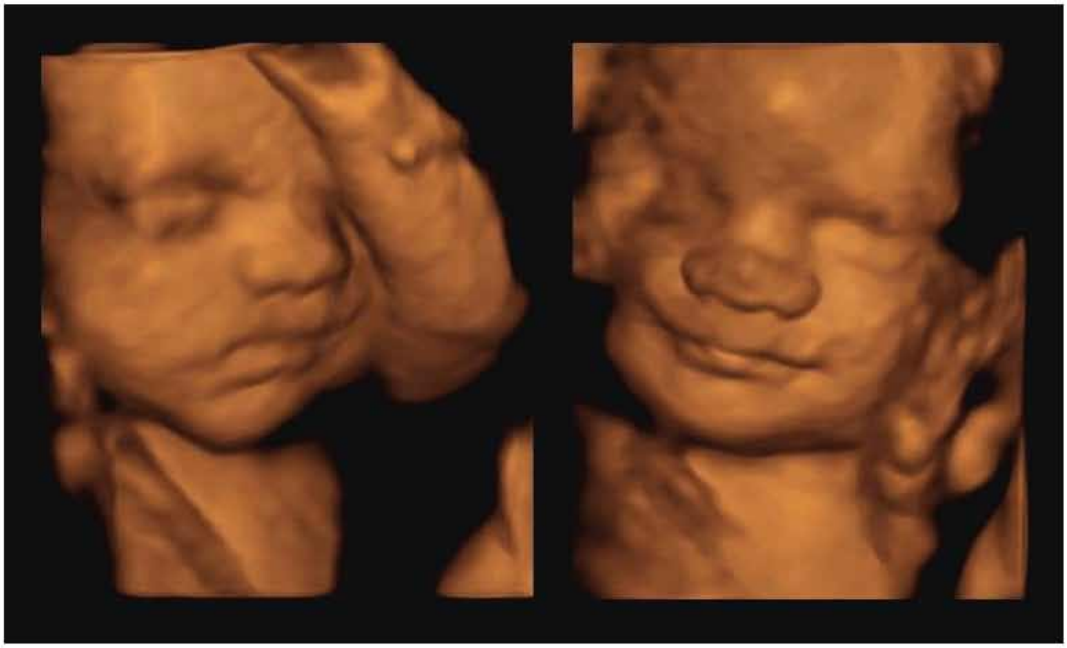

পদার্থবিজ্ঞান অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যে নতুন নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে তার একটি হচ্ছে জীব পদার্থবিজ্ঞান। এই নতুন বিষয়টির সুফল আমরা সরাসরি ভোগ করতে শুরু করেছি চিকিৎসাবিজ্ঞানে। আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম শরীরকে না কেটেই বাইরে থেকে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে পারব? পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে সত্যিই এটা ঘটছে। এই অধ্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয় সেরকম বেশ কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রোগ নির্ণয় এখন অনুমাননির্ভর নয়, বেশির ভাগ সময়েই সেটি সুনির্দিষ্ট। শুধু যে রোগ নির্ণয় তা নয়, রোগ নিরাময়ে বা চিকিৎসাতেও যে পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে করা সম্ভব এই অধ্যায়ে সেরকম উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা ও তত্ত্বের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করতে পারব।
- রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশংসা করতে পারব।

14.1 জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি (Background of Biophysics)

জীববিজ্ঞান জীবজগতের বৈচিত্র্য এবং তাদের জীবনধারণের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করে। জৈবিক প্রাণী কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে, একে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, পরিবেশকে অনুভব করে এবং বংশবৃদ্ধি করে এগুলো হচ্ছে জীববিজ্ঞানের বিষয়।

অন্যদিকে প্রকৃতির ভৌত জগৎ কোন নিয়ম মেনে চলে, সেই নিয়মগুলো কোন সহজ গাণিতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করে করা যায় সেগুলো হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পদার্থবিজ্ঞানের সরলতা এবং জীববিজ্ঞানের জটিলতার ভেতরে বুঝি কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে তার বিভিন্ন শাখার ওপর নির্ভর করে পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের মাঝে একটি যোগসূত্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে জীবপদার্থবিজ্ঞান (Biophysics)। জীবপদার্থবিজ্ঞান জৈবিক জগতের জটিল প্রক্রিয়ার ভেতরে পদার্থবিজ্ঞানের সহজ এবং গাণিতিক সূত্রগুলো প্রয়োগ করে জীবনের নানা ধরনের রহস্য অনুসন্ধান করে থাকে। এক কথায় বলা যায় জীবপদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের ভেতরকার সেতুবন্ধন।

জীবপদার্থবিজ্ঞান একদিকে যেরকম ডিএনএ কিংবা প্রোটিনে অণু-পরমাণুর বিন্যাস খুঁজে বের করতে পারে ঠিক সেরকম অন্যদিকে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ক্যান্সারের চিকিৎসা কিংবা কৃত্রিম কিডনি তৈরি করতে পারে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে বৈশ্বিক পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রণ থেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই।

14.2 জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান (Contributions of Jagadish Chandra Bose)

আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু (চিত্র 14.01) একদিকে ছিলেন একজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, অন্যদিকে একজন সফল জীববিজ্ঞানী। আমাদের এই উপমহাদেশে তিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া একজন বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষেরা থাকতেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তার জন্ম হয় 1858 সালের 30 নভেম্বর, ময়মনসিংহে। তার বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুর জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার লেখাপড়া শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে, পরে কলকাতায় হেয়ার স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা শেষ করেন। 1880

সালে বিএ পাস করার পর তিনি ইংল্যান্ড যান এবং 1880-1884 সালের ভেতরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। 1885 সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই যুগে তার কলেজে গবেষণার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না, তারপরও তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। দিনের বেলায় তার নানারকম ব্যস্ততা ছিল। তাই গবেষণার কাজ করতেন রাতের বেলায়।

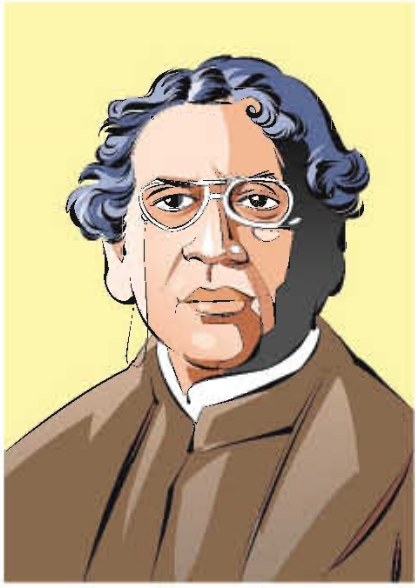

চিত্র 14.01: আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

বৈদ্যুতিক তার ছাড়া কীভাবে দূরে রেডিও সংকেত পাঠানো যায় এ বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেন। 1895 সালে তিনি প্রথমবারের মতো বেতারে দূরবর্তী স্থানে রেডিও সংকেত পাঠিয়ে দেখান। মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রেও তার বড় অবদান আছে, তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে (প্রায় 5 মিলিমিটার) নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রেডিও সংকেতকে শনাক্ত করার জন্য অর্ধপরিবাহী জংশন ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কার পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার পরিবর্তে তিনি সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারিগরি, প্রযুক্তিবিদ এবং পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (IEEE) তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে অভিহিত করেছে।

পরবর্তী সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ শরীরতত্ত্বের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এর মাঝে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার, খুব সূক্ষ্ম নাড়াচাড়া শনাক্ত এবং বিভিন্ন উদ্দীপকে সাড়া দেওয়ার বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। আগে ধারণা করা হতো উদ্দীপনের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি হচ্ছে রাসায়নিক, তিনি দেখিয়েছিলেন এটি আসলে বৈদ্যুতিক।

1917 সালে উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জগদীশচন্দ্র বসু বাংলায় লেখা রচনাবলি "অব্যক্ত" নামক গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হচ্ছে "Response in the living and nonliving".

1937 সালের 23 নভেম্বর জ্ঞানতাপস আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন।

14.3 মানবদেহ এবং যন্ত্র (Human Bodies and Machines)

আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করি। কোথাও যাবার জন্য গাড়িতে উঠি, খাবার সংরক্ষণ করার জন্য রেফ্রিজারেটরে রাখি, গরমের দিনে বাতাসের জন্য ফ্যান চালাই, খবর শোনার জন্য টেলিভিশন দেখি ইত্যাদি। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ এবং সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্র বলতে কী বোঝাই সেটা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে। আমরা জানি, মানবদেহকে একটা যন্ত্র বলা যায় না—একটা কোষ থেকে শুরু করে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি হয়, পৃথিবীতে এমন কোনো যন্ত্র নেই যেটি একটি ছোট ইউনিট দিয়ে শুরু করে নিজে নিজে পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রে পরিণত হয়। মানবদেহের ভেতরে কোনো কিছু বিকল হলে সেটি নিজে নিজে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে, কোনো যন্ত্রই সেটি পারে না। তারপরও পরিচিত জগতের সাথে তুলনা করার জন্য কিংবা মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম বোঝানোর জন্য আমরা অনেক সময়েই মানবদেহকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করি।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় আমাদের হৃৎপিণ্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প, যেটি বাইরের কোনো উদ্দীপনা (Stimulation) ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে। আমাদের কিডনি (বৃক্ক) একটি ছাঁকনি, যেটা রক্ত থেকে নাইট্রোজেন বর্জ্য সরিয়ে সেটাকে পরিশোধন করে। শরীরের হাড় এবং মাংসপেশি মিলে যান্ত্রিক লিভারের মতো কাজ করে কিংবা চোখ অনেকাংশেই ক্যামেরার মতো। শুধু তাই নয়, মানবদেহ জটিল একটা যন্ত্রের মতো ছোট ছোট অংশ বা অঙ্গ দিয়ে তৈরি, প্রত্যেকে বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে এবং এর যেকোনো একটি অচল বা বিকল হলে পুরো শরীরে কাজকর্ম ব্যাহত হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে মানবদেহ একটি জৈবযন্ত্রের মতো।

যন্ত্র দিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ইঞ্জিনে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অনেকটা সেভাবেই খাদ্য গ্রহণ করে এবং শ্বসনপ্রক্রিয়ায় আমরা খাবারের পুষ্টি থেকে শরীরের জন্য শক্তি সংগ্রহ করি।

এভাবে আমরা মানবদেহের সাথে যন্ত্রের অনেক মিল খুঁজে বের করতে পারলেও আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের এই মানবদেহ পৃথিবীর জটিলতম যন্ত্র থেকেও বেশি বিস্ময়কর, বেশি চমকপ্রদ এবং রহস্যময়। আমরা সেই রহস্যের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এখনো পুরোপুরি সমাধান করতে পারিনি।

14.4 রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (Diagnostic Instruments)

1950 সালে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু ছিল 50 বছরের কাছাকাছি, 60 বছরে সেই আয়ু 20 বছর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত হওয়া, রোগ প্রতিষেধক ব্যবহার,

স্বাস্থ্যসচেতন হওয়া এবং চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ার পেছনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির একটা সম্পর্ক আছে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পেছনে রয়েছে আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি, যেগুলো দিয়ে অনেক সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসকেরা রোগীর বাহ্যিক বিভিন্ন লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করতেন। শরীরের তখন অনেক কিছু অনুমান করতে হতো, সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা যেত না। আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে শুধু যে অনেক নিখুঁতভাবে রোগ নিরূপণ করা যাচ্ছে তা নয়, অনেক কার্যকরভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

এই অধ্যায়ে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো। তোমরা দেখবে এই যন্ত্রপাতিগুলোর সবগুলোতেই সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের কোনো একটি আবিষ্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে।

14.4.1 এক্স-রে (X-Ray)

1885 সালে উইলহেলোম রন্টজেন উচ্চশক্তিসম্পন্ন একধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেন, যেটি শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারত। এই রশ্মির প্রকৃতি তখন জানা ছিল না বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল এক্স-রে। এখন আমরা জানি এক্স-রে হচ্ছে আলোর মতোই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ ছোট, তাই তার শক্তিও সাধারণ আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি। যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক ছোট তাই আমরা খালি চোখে এক্স-রে দেখতে পাই না।

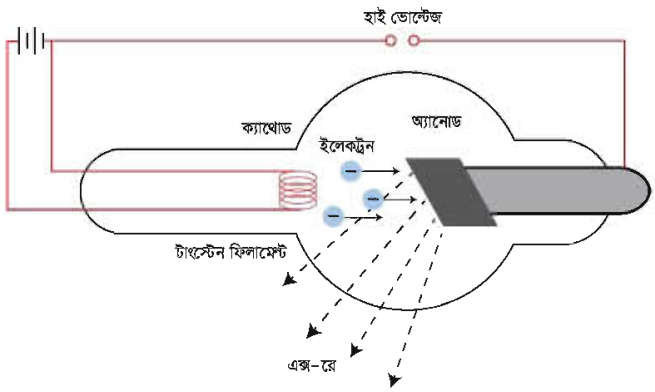

চিত্র 14.02: এক্স-রে টিউবের কার্যপদ্ধতি।

14.02 চিত্রে কীভাবে এক্স-রে তৈরি হয় সেটি দেখানো হয়েছে। একটি কাচের গোলকের দুই পাশে দুটি ইলেকট্রোড থাকে—একটি ক্যাথোড অন্যটি অ্যানোড। টাংস্টেনের তৈরি ক্যাথোডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে সেটি উত্তপ্ত করা হয়। তাপের কারণে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং অ্যানোডের

ধনাত্মক ভোল্টেজের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ক্যাথোড এবং অ্যানোডের ভেতর ভোল্টেজ যত বেশি হবে ইলেকট্রন তত বেশি গতিশক্তিতে অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে। এক্স-রে টিউবে এই ভোল্টেজ 100 হাজার ভোল্টের কাছাকাছি হতে পারে। ক্যাথোড থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটে আসা ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডকে আঘাত করে। এই শক্তিশালী ইলেকট্রনের আঘাতে অ্যানোডের পরমাণুর ভেতর দিকের কক্ষপথে থাকা ইলেকট্রন কক্ষপথচ্যুত হয়। তখন বাইরের দিকে কক্ষপথের কোনো একটি ইলেকট্রন সেই জায়গাটা পূরণ করে। এর কারণে যে শক্তিটুকু উদ্বৃত্ত হয়ে যায় সেটি শক্তিশালী এক্স-রে হিসেবে বের হয়ে আসে। ঠিক কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স-রে বের হবে সেটি নির্ভর করে অ্যানোড হিসেবে কোন ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর। সাধারণত তামাকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 14.03 চিত্রে একটি হাত এবং পায়ের এক্স-রে করা ছবি দেখানো হয়েছে। এক্স-রে অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়, নিচে তার কয়েকটি ব্যবহারের তালিকা দেওয়া হলো।

চিত্র 14.03: হাত এবং পায়ের এক্স-রে।

(a) স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় ইত্যাদি খুব সহজে শনাক্ত করা যায়।

(b) দাঁতের ক্যাভিটি এবং অন্যান্য ক্ষয় বের করার জন্য এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

(c) পেটের এক্স-রে করে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal Obstruction) শনাক্ত করা যায়।

(d) এক্স-রে দিয়ে পিত্তথলি ও কিডনিতে পাথরের অস্তিত্ব বের করা যায়।

(e) বুকের এক্স-রে করে ফুসফুসের রোগ যেমন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।

(f) এক্স-রে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে, তাই এটি রেডিওথেরাপিতে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রের অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ যেন শরীরে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এজন্যে কোনো রোগীর এক্স-রে নেওয়ার সময় এক্স-রে করা অংশটুকু ছাড়া বাকি শরীর সিসার তৈরি অ্যাপ্রোন দিয়ে ঢেকে নিতে হয়। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে গর্ভবতী মেয়েদের পেট বা তলপেটের অংশটুকু এক্স-রে করা হয় না।

14.4.2 আলট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography)

আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি ইত্যাদির ছবি তোলা হয়। এটি করার জন্য খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিধ্বনিকে শনাক্ত করা হয়। শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে বলে একে আলট্রাসনোগ্রাফি বলা হয়ে থাকে। 14.04 চিত্রে সাধারণ 2D এবং সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত 3D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি দেখানো হলো।

আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে ট্রান্সডিউসার নামে একটি স্ফটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উদ্দীপ্ত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আলট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। আলট্রাসনিক যন্ত্রে এই তরঙ্গকে একটা সরু বিমে পরিণত করা হয়। শরীরের ভেতরের যে অঙ্গটির প্রতিবিম্ব দেখার প্রয়োজন হয় ট্রান্সডিউসারটি শরীরের উপরে সেখানে স্পর্শ করে বিমটিকে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়, রোগী সে জন্য কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করে না। যে অঙ্গের দিকে বিমটি নির্দেশ করা হয় সেই অঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী আলট্রাসনিক তরঙ্গ প্রতিফলিত, শোষিত বা সংবাহিত হয়। যখন বিমটি মাংসপেশি বা রক্তের বিভিন্ন ঘনত্বের বিভেদতলে আপতিত হয় তখন তরঙ্গের একটি অংশ প্রতিধ্বনিত হয়ে পুনরায় ট্রান্সডিউসারে ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনিগুলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

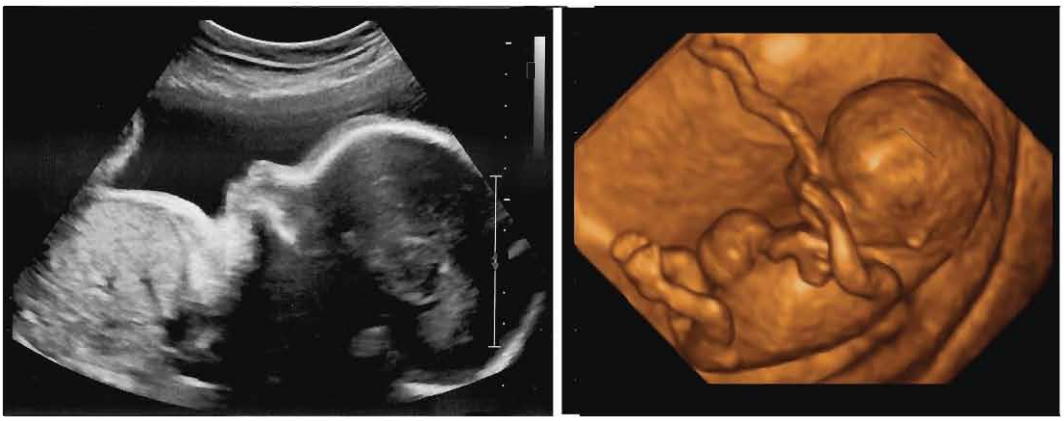

চিত্র 14.04: সাধারণ 2D এবং 3D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি।

আলট্রাসনোগ্রাফি নিজের কাজগুলো করার জন্য ব্যবহার করা হয়:

(a) আলট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে। এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার, গঠন, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান ইত্যাদি জানা যায়, প্রসূতিবিজ্ঞানে এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

(b) আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে জরায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের (Pelvic Mass) উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।

(c) পিত্তপাথর, হৃদযন্ত্রের ত্রুটি এবং টিউমার বের করার জন্যও আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য যখন আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয় তখন এই পরীক্ষাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলে।

এক্স-রের তুলনায় আলট্রাসনোগ্রাফি অনেক বেশি নিরাপদ, তবুও এটাকে ঢালাওভাবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সডিউসারটি যেন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটানা বিম না পাঠায় সেজন্য আলট্রাসাউন্ড করার সময় ট্রান্সডিউসারটিকে ক্রমাগত নড়াচড়া করাতে হয়।

14.4.3 সিটি স্ক্যান (CT Scan)

সিটি স্ক্যান শব্দটি ইংরেজি Computed Tomography Scan এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টমোগ্রাফি বলতে বোঝানো হয় ত্রিমাত্রিক বস্তুর একটি ফালির বা দ্বিমাত্রিক অংশের প্রতিবিম্ব তৈরি করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই যন্ত্রে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করার সময় শরীরের ভেতরের একবার ত্রিমাত্রিক অঙ্গের দ্বিমাত্রিক একটা প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। সিটি স্ক্যান যন্ত্রে একটি এক্স-রে টিউব রোগীর শরীরকে বৃত্তাকারে ঘুরে এক্স-রে নির্গত করতে থাকে এবং অন্য পাশে ডিটেকটর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে থাকে। প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট করার জন্য অনেক সময় রোগীর শরীরে বিশেষ Contrast দ্রব্য ইনজেকশন করা হয়।

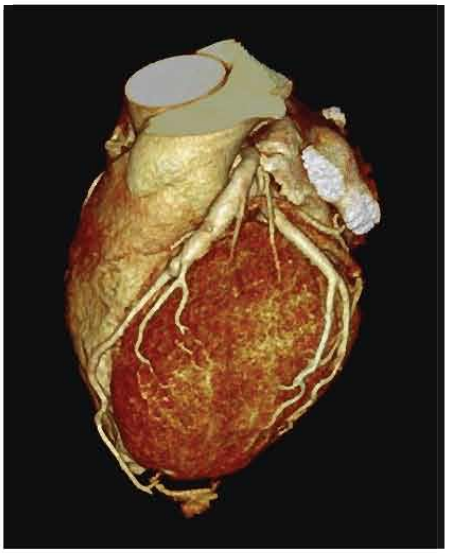

চিত্র 14.05: হৃৎপিণ্ডের সিটি স্ক্যান।

বৃত্তাকারে চারপাশের এক্স-রে প্রতিবিম্ব পাওয়ার পর কম্পিউটার দিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করে সমন্বয় করা হয় এবং একটি পরিপূর্ণ ফালির (Slice) অভ্যন্তরীণ গঠন পাওয়া যায়। একটি ফালির ছবি নেওয়ার পর সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র রোগীকে একটুখানি সামনে সরিয়ে আবার বৃত্তাকারে চারদিক থেকে এক্স-রে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে, যেগুলো বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় আরেকটি ফালির অভ্যন্তরীণ গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করে (চিত্র 14.05)। এভাবে রোগীকে একটু একটু করে সামনে এগিয়ে নিয়ে তার শরীরের কোনো একটি অঙ্গের অনেকগুলো ফালির প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। একটা

রুটির অনেকগুলো স্লাইস পরপর সাজিয়ে নিয়ে আমরা যেরকম পুরো রুটিটি পেয়ে যাই, ঠিক সেরকম শরীরের কোনো অঙ্গের অনেকগুলো স্লাইসের ছবি একত্র করে আমরা রোগীর শরীরের ভেতরের একটা ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি তৈরি করে নিতে পারি। সিটি স্ক্যানের কাজের পদ্ধতিটি দেখে তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল জটিল এবং একটি বিশাল যন্ত্র। তবে শরীরের ভেতরে না গিয়ে বাইরে থেকেই শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করতে পারে বলে এটি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের খুব প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র হয়ে (চিত্র 14.06) দাঁড়িয়েছে।

চিত্র 14.06: সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র।

সিটি স্ক্যান করে নিচের কাজগুলো করা সম্ভব:

(a) সিটি স্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনি, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়।

(b) যকৃৎ, ফুসফুস এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার শনাক্ত করার কাজে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

(c) সিটি স্ক্যানের প্রতিবিম্ব টিউমারকে শনাক্ত করতে পারে। টিউমারের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারে এবং সেটি টিউমারের আশপাশের টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে সেটিও জানিয়ে দিতে পারে।

(d) মাথার সিটি স্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতর কোনো ধরনের রক্তপাত হয়েছে কি না, ধমনি ফুলে গেছে কি না কিংবা কোনো টিউমার আছে কি না সেটি বলে দেওয়া যায়।

(e) শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কি না সেটিও সিটি স্ক্যান করে জানা যায়।

সতর্কতা: সিটি স্ক্যান করার জন্য যেহেতু এক্স-রে ব্যবহার করা হয় তাই গর্ভবতী মহিলাদের সিটি স্ক্যান করা হয় না। ছবির কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্য যে "ডাই" ব্যবহার করা হয় সেটি কারো কারো শরীরে অ্যালার্জির জন্ম দিতে পারে বলে সেটি ব্যবহার করার আগে সতর্ক থাকতে হয়।

14.4.4 এমআরআই (MRI: Magnetic Resonance Imaging)

মানুষের শরীরের প্রায় সত্তর ভাগ পানি, যার অর্থ মানুষের শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পানি থাকে (পানির প্রতিটি অণুতে থাকে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হচ্ছে প্রোটন।) শক্তিশালী

চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করলে প্রোটনগুলো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে সারিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন নির্দিষ্ট একটি কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠানো হলে এই প্রোটনগুলো সেই তরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করে তাদের দিক পরিবর্তন করে এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বলে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স (অনুনাদ)। পদার্থবিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ ঘটনাটির ওপর ভিত্তি করে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং বা এমআরআই তৈরি করা হয়েছে (চিত্র 14.07)।

এমআরআই যন্ত্রটি দেখতে সিটি স্ক্যান যন্ত্রের মতো কিন্তু এর কার্যপ্রণালি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিটি স্ক্যান যন্ত্রে এক্স-রে পাঠিয়ে প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়, এমআরআই যন্ত্রে একজন রোগীকে অনেক শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রেখে তার শরীরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দেওয়া হয়। শরীরের পানির অণুর ভেতরকার হাইড্রোজেনের প্রোটন থেকে ফিরে আসা সংকেতকে কম্পিউটার দিয়ে বিশ্লেষণ করে শরীরের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়।

সিটি স্ক্যান দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব, এমআরআই দিয়েও সেগুলো করা যায়। তবে এমআরআই দিয়ে শরীরের ভেতরকার কোমল টিস্যুর ভেতরকার পার্থক্যগুলো ভালো করে বোঝা সম্ভব। সিটি স্ক্যান করতে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি সময়ের দরকার হয় না, সেই তুলনায় এমআরআই করতে একটু বেশি সময় নেয়। সিটি স্ক্যানে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় বলে যত কমই হোক তেজস্ক্রিয়তার একটু ঝুঁকি থাকে, এমআরআইয়ে সেই ঝুঁকি নেই।

শরীরের ভেতরে কোনো ধাতব কিছু থাকলে (যেমন: পেস মেকার) এমআরআই করা যায় না, কারণ আর এফ তরঙ্গ ধাতুকে উত্তপ্ত করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

চিত্র 14.07: এমআরআই করার যন্ত্র।

14.4.5 এনজিওগ্রাফি (Angiography)

এক্স-রের মাধ্যমে শরীরের রক্তনালিগুলো দেখার জন্য এনজিওগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করে রক্তনালি ভালোভাবে দেখা যায় না বলে এনজিওগ্রাফি করার সময় রক্তনালিতে বিশেষ Contrast Material বা বৈসাদৃশ্য তরল (ডাই) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রক্তনালির যে অংশটুকু পরীক্ষা করতে হবে ঠিক সেখানে ডাই দেওয়ার জন্য একটি সরু এবং নমনীয় নল কোনো একটি আর্টারি দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই সরু এবং নমনীয় নলটিকে বলে ক্যাথিটার। ক্যাথিটার দিয়ে রক্তনালির নির্দিষ্ট জায়গায় ডাই দেওয়ার পর সেই এলাকায় এক্স-রে নেওয়া হয়। ডাই থাকার কারণে এক্স-রেতে

রক্তনালিগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়। ডাই পরে কিডনির সাহায্যে ছেঁকে আলাদা করা হয় এবং প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

সাধারণত যেসব সমস্যা পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তাররা এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন, সেগুলো হচ্ছে:

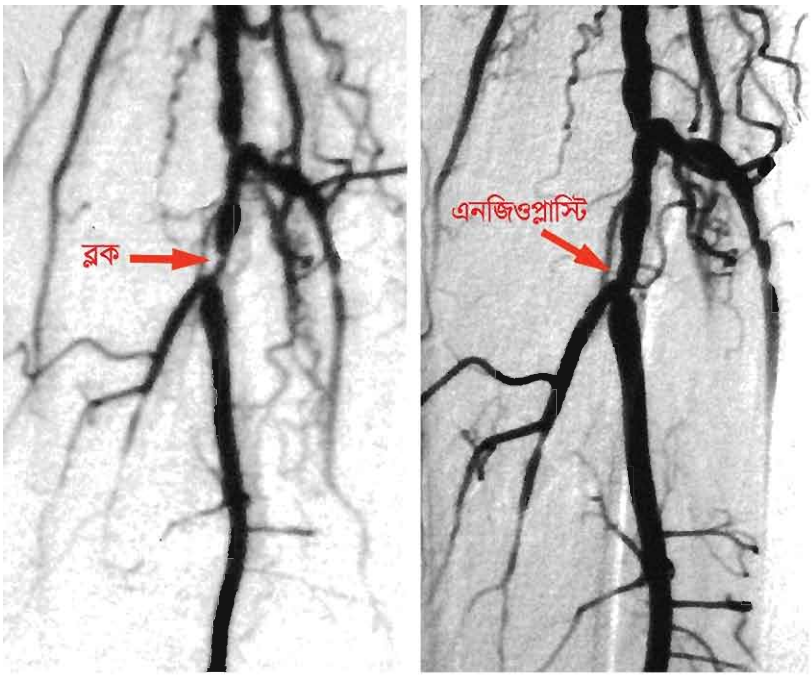

চিত্র 14.08: বামের ছবিতে রক্তনালিগুলোর এনজিওগ্রাফিতে ধমনিতে ব্লকেজ দেখা যাচ্ছে এবং ডানের ছবিতে এনজিওপ্লাস্টি করার পর স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ।

(a) হৃৎপিণ্ডের বাইরের ধমনিতে ব্লকেজ হলে (চিত্র 14.08)। রক্তনালি ব্লক হলে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ হতে পারে না, হৃৎপিণ্ডে যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ করা না হলে সেটি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

(b) ধমনি প্রসারিত হলে

(c) কিডনির ধমনির অবস্থাগুলো বোঝার জন্য

(d) শিরার কোনো সমস্যা হলে।

সিটি স্ক্যান কিংবা এমআরআই করার সময় সকল পরীক্ষা শরীরের বাইরে থেকে করা হয়। এনজিওগ্রাম করার সময় একটি ক্যাথিটার শরীরের ভেতরের রক্তনালিতে ঢোকানো হয় বলে কোনো রকম সার্জারি না করেই তাৎক্ষণিকভাবে রক্তনালি ব্লকের চিকিৎসা করা সম্ভব। যে প্রক্রিয়ায়

২০১৮

এনজিওগ্রাম করার সময় ধমনির ব্লক মুক্ত করা হয় তাকে এনজিওপ্লাস্টি বলা হয়। এনজিওপ্লাস্টি করার সময় ক্যাথিটার দিয়ে ছোট একটি বেলুন পাঠিয়ে সেটি ফুলিয়ে রক্তনালিকে প্রসারিত করে দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে একটি রিং (ring) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যেন সংকুচিত ধমনিটি প্রসারিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় রক্তের প্রবাহ হতে পারে।

14.4.5 এন্ডোসকপি (Endoscopy)

চিকিৎসাজনিত কারণে শরীরের ভেতরের কোনো অঙ্গ বা গহ্বরকে বাইরে থেকে সরাসরি দেখার প্রক্রিয়াটির নাম এন্ডোসকপি। এন্ডোসকোপি যন্ত্র দিয়ে শরীরের ফাঁপা অঙ্গগুলোর ভেতরে পরীক্ষা করা যায় (চিত্র 14.09)।

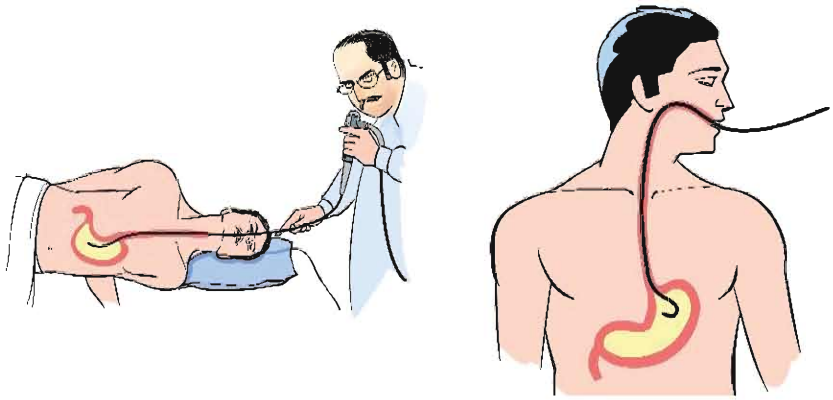

চিত্র 14.09: এন্ডোসকপির মাধ্যমে পাকস্থলীর ভেতরে দেখার প্রক্রিয়া।

এন্ডোসকপি যন্ত্রে দুটি স্বচ্ছ নল থাকে। একটি নল দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গের ভেতরে তীব্র আলো ফেলা হয়। এটি করা হয় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে, আলো এই ফাইবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলের মাধ্যমে প্রবেশ করে। রোগীর শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত বা রোগাক্রান্ত জায়গাটি আলোকিত করার পর সেই এলাকার ছবিটি দ্বিতীয় স্বচ্ছ নলের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। কোনো বস্তু দেখতে হলে সেটি সরলরেখায় থাকতে হয় কিন্তু শরীরের ভেতরের কোনো অঙ্গের ভেতরে সরলরেখায় তাকানো সম্ভব নয়, তাই ছবিটি দেখার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়, যেখানে আলো পূর্ণ অভ্যন্তরিন প্রতিফলন করে আঁকাবাঁকা পথে যেতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট জায়গা সূক্ষ্মভাবে দেখার জন্য অত্যন্ত সরু 5 থেকে 10 হাজার অপটিক্যাল ফাইবারের একটি বান্ডিল ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ফাইবার একটি বিন্দুর প্রতিচ্ছবি নিয়ে আসে বলে সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিখুঁত একটি ছবি দেখা সম্ভব হয়। অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরু হয় বলে 5 থেকে 10 হাজার ফাইবারের বান্ডিলটির প্রস্থচ্ছেদও কয়েক মিলিমিটার থেকে বেশি হয় না।

বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সিসিডি ক্যামেরার প্রযুক্তির কারণে এন্ডোসকপি যন্ত্রের আগায় একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা বসিয়ে সেটি সরাসরি শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে ভিডিও সিগন্যাল দেখা সম্ভবপর হচ্ছে। এন্ডোসকপি ব্যবহার করে ডাক্তাররা যেকোনো ধরনের অস্বস্তিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। যে অঙ্গগুলো পরীক্ষা করার জন্য এন্ডোসকপি ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

(a) ফুসফুস এবং বুকের কেন্দ্রীয় বিভাজন অংশ।
(b) পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র বা কোলন।
(c) স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ।
(d) উদর এবং পেলভিস।
(e) মূত্রনালির অভ্যন্তর ভাগ।
(f) নাসাগহ্বর, নাকের চারপাশের সাইনাস এবং কান।

এন্ডোসকপি করার সময় যেহেতু একটি নল সরাসরি ক্ষত স্থানে প্রবেশ করানো হয় সেটি দিয়ে সেই ক্ষত স্থানের Sample নিয়ে আসা সম্ভব এবং প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করে কিছু কিছু সার্জারিও করা সম্ভব।

14.4.6 ইসিজি (ECG)

ইসিজি হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electro Cardiogram) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসিজি করে মানুষের হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কাজকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা জানি বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ড ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে এবং এই সংকেত পেশির ভেতর ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে হৃৎস্পন্দন হয়। ইসিজি যন্ত্র (চিত্র 14.10) ব্যবহার করে আমরা হৃৎপিণ্ডে এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো শনাক্ত করতে পারি। এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এবং ছন্দময়তা পরিমাপ করা যায়। ইসিজি সিগন্যাল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের একটি পরোক্ষ প্রমাণ দেয়।

চিত্র 14.10: ইসিজি মেশিন।

ইসিজি করতে হলে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো গ্রহণ করার জন্য শরীরে ইলেকট্রোড লাগাতে হয়। দুই হাতে দুটি, দুই পায়ে দুটি এবং ছয়টি হৃৎপিণ্ডের অবস্থানসংলগ্ন বুকের ওপর লাগানো হয়। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড থেকে বৈদ্যুতিক সংকেতকে সংগ্রহ করা হয়। এই সংকেতগুলোকে যখন ছাপানো হয় (চিত্র 14.11) তখন সেটিকে বলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

একজন সুস্থ মানুষের প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ সংকেতের একটা স্বাভাবিক নকশা থাকে। যদি কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয় তখন তার ইলেকট্রোড থেকে পাওয়া সংকেতগুলো স্বাভাবিক নকশা থেকে ভিন্ন হবে।

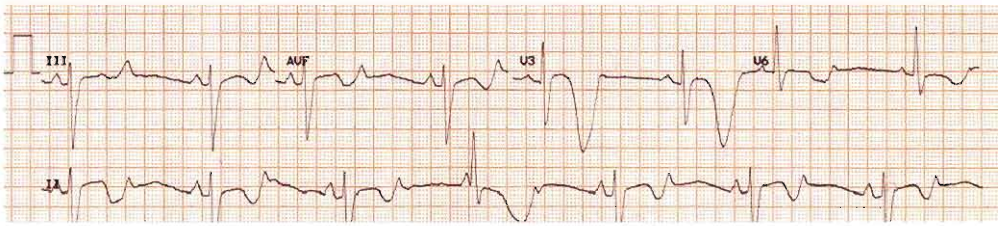

চিত্র 14.11: ইসিজি মেশিন থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ সংকেত।

সাধারণ কোনো রোগের কারণ হিসেবে বুকের ধড়ফড়ানি, অনিয়মিত কিংবা দ্রুত হৃৎস্পন্দন বা বুকের ব্যথা হলে ইসিজি করা হয়। এছাড়া নিয়মিত চেকআপ করার জন্য কিংবা বড় অপারেশনের আগে ইসিজির সাহায্য নেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের যেসব ইসিজি করা যায় সেগুলো হচ্ছে:

(a) হৃৎপিণ্ডের যেসব অস্বাভাবিক স্পন্দন অর্থাৎ স্পন্দনের হার বেশি বা কম হলে
(b) হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে
(c) হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে থাকলে

ইসিজি মেশিনটি অত্যন্ত সহজ-সরল মেশিন কিন্তু এটি ব্যবহার করে শরীরের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বলে একজন রোগীর চিকিৎসার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

14.4.7 ইটিটি (ETT)

ইংরেজি Exercise Tolerance Test এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ইটিটি। ব্যায়াম বা অনুশীলন করার সময় ইসিজি করাকেই ইটিটি বলা হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড থেকে যে বৈদ্যুতিক সংকেত আসে সেখানে অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের প্রকৃত অবস্থাটি বোঝা যায় না। রোগীকে বাড়তি শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করানো হলে হৃৎপিণ্ডের

ওপর বাড়তি চাপ পড়ে, তখন হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা এবং স্পন্দনের হার এবং ছন্দময়তা দেখে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনিতে আংশিক অবরুদ্ধ অবস্থা থাকলে সেটি অনেক সময় ইটিটি করে শনাক্ত করা যায়।

ইটিটি করার সময় রোগীকে বাড়তি শারীরিক পরিশ্রম করানোর জন্য স্থির সাইকেল চালাতে হয় কিংবা ট্রেডমিলে হাঁটতে হয়। পরীক্ষার সময় সাইকেলের চাকার গতি ধীরে ধীরে বাড়ানো হয় কিংবা ট্রেডমিলের ঢাল বাড়ানো হয় এবং এই বাড়তি পরিশ্রমের কারণে রোগীর হৃৎপিণ্ড কী রকম প্রতিক্রিয়া করে সেটা দেখার জন্য ইসিজি রেকর্ড করা হয়। সাধারণত একজন ডাক্তার সার্বক্ষণিকভাবে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

ইটিটি পরীক্ষার সময় অনুশীলনের সময় রোগীর হৃৎপিণ্ডে যে পরিবর্তনগুলো হয় ইসিজিতে একজন ডাক্তার সেগুলো শনাক্ত করে রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

14.5 রোগ নিরাময়ে পদার্থবিজ্ঞান (Physics in Treatment)

14.5.1 রেডিওথেরাপি (Radio Therapy)

রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজি Radiation Therapy শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। রেডিওথেরাপি হচ্ছে কোনো রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার। এটি মূলত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। রেডিওথেরাপিতে সাধারণত উচ্চ ক্ষমতার এক্স-রে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা হয়। এই এক্স-রে ক্যান্সার কোষের ভেতরকার ডিএনএ (DNA) ধ্বংস করে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। একটি টিউমারকে সার্জারি করার আগে ছোট করে নেওয়ার জন্য কিংবা সার্জারির পর টিউমারের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করার জন্যও রেডিওথেরাপি করা হয়।

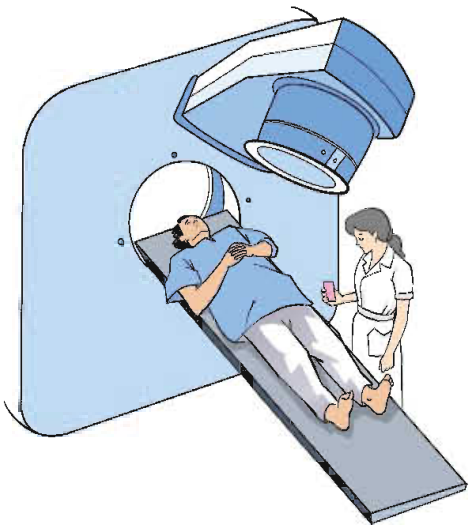

চিত্র 14.12: রেডিওথেরাপি যন্ত্র।

বাইরে থেকে রেডিওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করার জন্য সাধারণত একটি লিনিয়ার এক্সেলেটর ব্যবহার করে উচ্চক্ষমতার এক্স-রে তৈরি করা হয়। শরীরে যেখানে টিউমারটি থাকে সেদিকে তাক করে

তেজস্ক্রিয় বিমটি পাঠানো হয় (চিত্র 14.12)। বিমটি তখন শুধু ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে দেয় না, তার বিভাজনক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। বিমটি শুধু ক্যান্সার আক্রান্ত জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয় না বলে আশপাশের কিছু সুস্থ কোষও ধ্বংস হয় কিন্তু এই রেডিওথেরাপি বন্ধ হওয়ার পর সুস্থ কোষগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে।

14.5.2 আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার (Isotopes and Their Uses)

তোমরা জানো একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হলে তাকে সেই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে। প্রকৃতিতে অনেক মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপকে স্বাভাবিকভাবে তেজস্ক্রিয় হিসেবে পাওয়া যায় আবার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বানানো সম্ভব। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। এই আইসোটোপগুলো রোগ নির্ণয় করার জন্য যেরকম ব্যবহার করা যায় ঠিক সেরকম রোগ নিরাময়ের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

শরীরের কোনো কোনো অঙ্গে মাঝে মাঝে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো যৌগিক পদার্থ যুক্ত হয়। সেই যৌগিক পদার্থের পরিমাণ দেখে অঙ্গটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। যৌগটির পরিমাণ বোঝার জন্য যৌগটির কোনো একটি পরমাণুকে তার একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয় এবং সেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটির বিকিরণ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্গে যৌগের পরিমাণ বোঝা যায়। সাধারণত আইসোটোপটি গামা রে বিকিরণ করে এবং বাইরে থেকেই এই গামা রে শনাক্ত করা যায়।

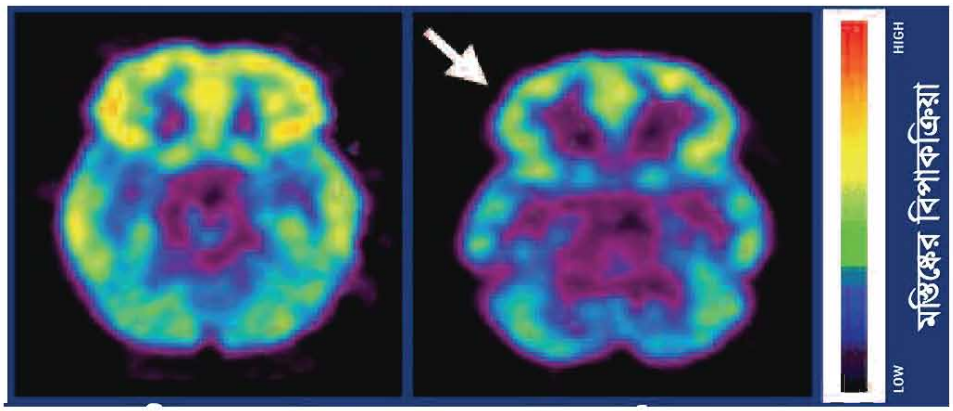

চিত্র 14.13: PET scan দিয়ে দেখা স্বাভাবিক এবং কোকেন মাদকাসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীল অংশের ছবি।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ PET বা Positron Emission Tomography যেখানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি পজিট্রন বিকিরণ করে। তোমরা জানো পজিট্রন ইলেকট্রনের প্রতিপদার্থ (anti particle) এবং এটি ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তর হয়। এই শক্তি দুটো গামা রে হিসেবে বিপরীত দিকে বের হয়ে আসে। কাজেই বিপরীত দিকে দুটি নির্দিষ্ট শক্তির গামা রে শনাক্ত করে পজিট্রনটি কোথা থেকে বের হয়েছে সেটি বের করে নেওয়া যায়। সেই তথ্য থেকে আমরা শুধু যে পজিট্রন তৈরির অস্তিত্ব জানতে পারি তা নয়, সেটি ঠিক কোথায় কতটুকু আছে সেটাও বলে দিতে পারি। গ্লুকোজের ভেতর পজিট্রন বিকিরণ করে সেরকম একটি আইসোটোপ যুক্ত করে দিলে PET ব্যবহার করে আমরা মস্তিষ্কের কোথায় কতটুকু গ্লুকোজ জমা হয়েছে সেটি বের করতে পারব। এই তথ্য থেকে কোন সময় মস্তিষ্কের কোন অংশ বেশি ক্রিয়াশীল এবং বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করেছে (চিত্র 14.13) সেই তথ্যও বের করা সম্ভব। PET প্রযুক্তি মানুষের মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি বের করার ব্যাপারে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে শুধু যে রোগ নির্ণয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মপদ্ধতি বের করা হয় তা নয়, এটি দিয়ে রোগ নিরাময়ও করা হয়। কোবাল্ট-60 (^{60}Co) একটি গামা রে বিকিরণকারী আইসোটোপ, এই আইসটোপ ব্যবহার করে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে গামা রে দিয়ে ধ্বংস করা হয়। আয়োডিন-131 (^{131}I) থাইরয়েডের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়, থাইরয়েডের চিকিৎসায় এটি এতই কার্যকর, যা আজকাল থাইরয়েডের সার্জারির সেরকম প্রয়োজন হয় না।

এছাড়া লিউকেমিয়া নামে রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ফসফরাস-32 (^{32}P) যুক্ত ফসফেট ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

1. ভৌতজগৎ ও জীবজগৎ কি সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে?
2. জীবপদার্থবিজ্ঞানের সূচনা কীভাবে হলো?
3. পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো কেন জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়?
4. পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান বর্ণনা করো।

5. জীবপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান কী?

6. মানবদেহ কখনো কখনো যন্ত্রের মতো আচরণ করে—ব্যাখ্যা করো।

7. মানবদেহ একটি জৈব যন্ত্র—এর সপক্ষে যুক্তি দাও।

8. পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কীভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

9. রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত কতগুলো যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

10. এক্স-রে কী? রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লেখ।

11. আলট্রাসনোগ্রাফি কীভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে।

12. এমআরআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবিম্বের বর্ণনা দাও।

13. ইসিজির সাহায্যে কোন কোন রোগ নির্ণয় করা যায়?

14. এন্ডোসকপি যন্ত্র কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

15. চিকিৎসাক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি কেন ব্যবহার করা হয়?

16. ইটিটি এক ধরনের ইসিজি পরীক্ষা—বর্ণনা করো।

17. কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাম করা হয়?

18. আইসোটোপ কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে এটি কী কাজে লাগে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

1. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সাথে কোন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট?
   i. বসু মন্দির প্রতিষ্ঠা
   ii. তেজস্ক্রিয় মৌলের ব্যবহার
   iii. ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

2. X-Ray ফিল্মে হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কারণ:

(ক) হাড় X-Ray দ্বারা অভেদ্য (খ) মাংসপেশি X-Ray দ্বারা অভেদ্য
(গ) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি (ঘ) উঁচু ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন

3. সূক্ষ্ম রক্তনালিকার ব্লকেজ পরীক্ষা করার প্রযুক্তির নাম হলো:
   (ক) এনজিওগ্রাম (খ) এনজিওপ্লাস্টি
   (গ) ইটিটি (ঘ) ইসিজি

4. হৃৎস্পন্দনের হার অছন্দময়তা পরিমাপ করা হয় কীভাবে?
   (ক) তড়িৎ সংকেত শনাক্ত করে (খ) X-Ray এর মাধ্যমে
   (গ) নিউক্লীয় চৌম্বক অনুনাদের মাধ্যমে (ঘ) শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. বিনুর চাচি মা হতে চলেছেন। চেকআপের জন্য তিনি নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যান। কোনো এক মাসে ডাক্তার ভ্রূণের সঠিক অবস্থান ও আকার জানার জন্য তাকে একটি পরীক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে তিনি পরীক্ষাটি করালেন এবং এর মাধ্যমে ডাক্তার ভ্রূণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করলেন।
   (ক) এমআরআই-এর পূর্ণরূপ কী?
   (খ) আইসোটোপগুলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রূপভেদ কেন?
   (গ) ভ্রূণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভে আলট্রাসনোগ্রাফির ভূমিকা আলোচনা করো।
   (ঘ) বিনুর চাচির পরীক্ষাটি অন্য কোনো চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে করা যাবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

2. দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগতে থাকা রোগীর বুকের এক্স-রে রিপোর্ট দেখে ডাক্তার সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দিলেন। পাশাপাশি ব্যবস্থাপত্রে নিয়মিত খাবার জন্য ঔষধ লিখে দিয়ে সাত দিন পর দেখা করার কথা বললেন।
   (ক) এক্স-রে কী?
   (খ) এক্স-রের বদলে আলট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহার কেন করা হয় না?
   (গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীর ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান কী ধরনের উপকারে আসতে পারে— ব্যাখ্যা করো।
   (ঘ) উল্লিখিত রোগীর জন্য সিটি স্ক্যানের বিকল্প হিসেবে এমআরআই এর ব্যবহার করার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করো।